ডায়াবেটিস নিউজলেটার

দাম ১০ টাকা

এক দেশের এক শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর
ডায়াবেটিস জয়ের কাহিনী
অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী

শুনতে অবাক লাগে, অথচ সত্যি ঘটনা!

ভিনদেশী এই সুন্দরী নারী ডায়াবেটিক রোগী হয়েও পৌঁছেছিলেন খ্যাতির শীর্ষে, এক সময় হয়েছিলেন গর্ভবতী, জন্ম দিয়েছিলেন সুস্থ একটি মেয়ে সন্তানের, এক সময় হয়েছিলেন মিস আমেরিকাও!

গর্ভধারণকালে কী করে তিনি রক্তের গ্লুকোজের মান ঠিক রাখলেন, কী করে তিনি পেলেন বিশ্বস্ত একজন ডাক্তার, টাইপ-১ ডায়াবেটিস নিয়েও কীভাবে তিনি সন্তান প্রসব করলেন– এসব ঘটনা জানলে অনেক ডায়াবেটিক নারী, বিশেষত যারা গর্ভধারণ করতে গিয়ে শংকিত হচ্ছেন তারা মনে সাহস পাবেন।

সহজ-সরল আমুদে মেয়ে ছিলেন তিনি।

বছর তেরো আগে তার ডায়াবেটিস ধরা পড়ল। তাকে বলা হলো, এ রোগ যখন হয়েছে, তখন তার শখের পেশা জার্নালিজম আর করা যাবে না, বিয়ে, সন্তানের জন্ম দেয়া এসবও করা যাবে না । কি নির্মম উক্তি!

কিন্তু এ নারী ছিলো অন্যরকম। মনে খুব জোর ছিলো তার। নিজের দৃঢ় ধারণাই তার সম্বল। তিনি এগিয়ে গেলেন। বছর ছয়েক পর হয়ে গেলেন মিস্ আমেরিকা। এমনকি ডায়াবেটিস গবেষণা ও শিক্ষার ব্যাপারেও এক সময় হয়ে উঠলেন একজন প্রবক্তা ও উদ্যোক্তা।

নাম জানতে চাইছেন নিশ্চয়ই? নিকোল জনসন বেকার তার নাম। ১৯৯৯ সালে মিস্ আমেরিকা হন তিনি। নিকোল জনস্বাস্থ্য বিষয়ে মাস্টার্স করলেন। দ্বিতীয় মাস্টার্স। এর আগে করেছেন জার্নালিজমে মাস্টার্স। পরিবারে এলো আভা গ্রেস। ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে!

অথচ গর্ভবতী হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি জানতেন না যে রক্তের গ্লুকোজের মান এত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। গর্ভে বেড়ে ওঠা সন্তানটি তার রক্তের গ্লুকোজের ওঠানামাকে মোকাবেলা করেই গড়ে উঠবে।

(বাকি অংশ ৫ পৃষ্ঠায়)

স্বা স্থ্য খ ব র

দেহের ভেতরে মাইক্রোচিপ

এ যুগে ইলেকট্রিনিক যন্ত্রে মাইক্রোচিপের ব্যবহার অহরহ। কিন্তু তাই বলে মানবদেহের ভেতর মাইক্রোচিপ! অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনের অধিবাসী বেন স্লাটার এ কাজটি করেই আলোচনায় এসেছেন। তিনি আশা করছেন, নতুন প্রজন্মের আইফোনের মতো ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো তার এই অত্যাধুনিক মাইক্রোচিপটি পড়তে পারবে। পেশায় বিজ্ঞাপন পরিচালক স্লাটার সপ্তাহ দুয়েক আগে মেলবোর্নের একটি ট্যাটু পার্লারে গিয়ে মাইক্রোচিপটি তার বাঁ হাতের চামড়ার নিচে প্রবেশ করান। সিরিঞ্জ দিয়ে পুশ করেই চিপটি জায়গামতো বসানো গেছে। চিপটি একটি চালের সমান। তাই চামড়ার নিচে ঢোকাতে বা বহন করতে কোনোরকম বেগ পেতে হয়নি। স্লাটার জানান, চিপটি ঢোকাতে একটু ব্যথা লাগলেও খুব দ্রুতই কাজটি শেষ হয়।

চিপ লাগানোয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলো স্লাটারের হাতের কথা শুনছে। হাতের নড়াচড়াতেই তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন বিভিন্ন যন্ত্র। দরজা খুলতে বা বাতি জ্বালাতে এখন আর তাকে কিছু স্পর্শ করতে হয় না। যাচ্ছে ব্যক্তিগত তথ্য। আজ বাজারে আসছে অ্যাপলের আইফোন-৬। স্লাটারের আশা, এটি তার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মাঝে বসানো চিপ দিয়ে চালানো যাবে। ●

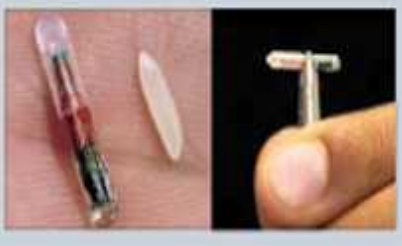

বন্ধ্যাত্বের কিছু কথা

অধ্যাপক লায়লা আর্জুমান্দ বানু

একবার গিয়েছিলাম বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার ওপর একটি ট্রেনিং করতে। সেখানে দেখেছি, একটি বাচ্চার জন্য মানুষের কত হাহাকার। আবার যখন চিকিৎসার পর কোলে একটি বাচ্চা এসেছে, তখন মা-বাবার মুখে যে অনির্বচনীয় আনন্দের অভিব্যক্তি- তার বুঝি কোনো তুলনা হয় না। কৃতজ্ঞতায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পারলে ডাক্তারের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েন। সেখানে দেখা, অসংখ্য ঘটনার দু' তিনটির কথাই আজ জানাবো। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ৩টি রোগীই ডায়াবেটিক। তাই হয়ত আমার মনে বেশি রেখাপাত করেছে।

আমি আবার মা হবোই

আমি ও আমার এক সতীর্থ আমরা হেঁটে ইনস্টিটিউটে যাচ্ছি। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ ডাকলো- আপা! আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, বাংলাদেশেরই মেয়ে। আমাকে বললো, আপা আমাকে চিনতে পারছেন না? না চেনারই কথা, তবু সে বললো, আপনি আমাকে ২০০০ সালে বারডেমে ল্যাপারোস্কোপি করে বলেছিলেন, আমি কখনো মা হতে পারবো না। আপনি বলেছিলেন, এন্ডোমেট্রিওসিস নামের একটি অসুখের কথা।

সত্যিই খুব জটিল পর্যায়ে ছিলো। যার জন্য ল্যাপারোস্কোপি করে বলেছিলাম কথাটা। বোধ হয় অন্য জটিলতাও ছিলো। জরায়ুতে অনেক টিউমার। তবুও সে ২০০০ থেকে এখানেই চিকিৎসা করাচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, তার জরায়ুর যে অবস্থা তাতে প্রেগন্যান্সি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে বাচ্চা নিতে চাইলে 'সারোগেট মাদার' নিতে হবে। 'সারোগেট মাদার' হচ্ছে, রোগীর ডিম্বাণু ও স্বামীর শুক্রাণু নিয়ে টিউবে বাচ্চা হবার পর (Embryo) অন্য আরেক মহিলার গর্ভে বাচ্চাটি দিয়ে দেয়া। নয় মাস পর বাচ্চাটি জন্ম নিলে আসল মাকে বাচ্চাটি দিয়ে দেয়া হয়। অনেক গরীব মহিলাই অর্থের বিনিময়ে এ কাজটি করে থাকেন। এ নিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ ঘটনাও খবরের কাগজে এসেছে।

অনেক সারোগেট মা-ই শেষ পর্যন্ত আসল মাকে বাচ্চা দিতে রাজি হয় না। কারণ নয়মাস ধরে বাচ্চাটিকে গর্ভে ধারণ করার পর অনেকেই বাচ্চার মায়া ছাড়তে পারেন না। একবার তো এ নিয়ে মামলা পর্যন্ত হয়েছিলো। মামলায় অবশ্য আসল মা-বাবাই জিতে যান। যাই হোক, এই রোগীটি স্থানীয় একটি মহিলাকে জোগাড় করেছে সারোগেট মা হিসেবে। দুজনেই উৎকণ্ঠিত, এবারে সফল হবে তো? মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আপা, আপনি একটা ইনস্টিটিউট খোলেন, আমি আবার চিকিৎসা নেবো আপনার কাছ থেকে, আবার 'মা' হবো আমি। মেয়েটির চোখে পানি চিক্‌চিক্ করছিলো। ওর সেই ব্যথাহত মুখ আমাকে অনেকক্ষণ কষ্ট দিয়েছিলো।

আমি না, ও

আপনাদের হয়ত অবাক লাগছে কথাটা শুনে, তাই না? এ আবার কেমন কথা? আমি না, ও। আসলে এটিও সেই ইনস্টিটিউটেরই আরেকটি ঘটনা। আমরা বসে কেস হিস্ট্রি দেখছি। ওখানকার কনসালট্যান্ট আউটডোরের রোগী দেখছেন। হঠাৎ শুনলাম, উঁচু গলায় কেউ বলছে, আমি না ও। আমরা কৌতূহলী হলাম। ঘুরে বসে দেখলাম ব্যাপারটি কি। দুটি মহিলা ও একজন পুরুষ। চিকিৎসাপত্র দেয়ার পর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপারটা কী? স্যার বললেন, মেয়েটির প্রিম্যাচিওর ওভারিয়ান ফেইলিওর। অর্থাৎ বয়স বেশি না হলেও মেয়েটির ডিম্বাশয় থেকে কোনো ডিম তৈরি হচ্ছে না। অনেক কারণেই এটা হতে পারে। তবে মেয়েটির অনেকদিন থেকে ডায়াবেটিস। এবং সে মোটেও তা কন্ট্রোলে রাখে না। যাই হোক, তাকে অনেক হরমোন চিকিৎসা দেয়ার পরও কোনো কাজ হচ্ছে না। তাই তাকে বলা হয়েছে এমন একজন মহিলা খুঁজতে যার ডিম্বাশয় থেকে ডিম নেয়া যেতে পারে। তাই রোগীটি তার এক আত্মীয়কে নিয়ে এসেছে 'ওভাম ডোনেশনে'র জন্য। যখন জিজ্ঞেস করা হলো রোগী কে? সাথে সাথে আত্মীয়টি জোর গলায় বললো, আমি না ও। মানে, সে রোগীকে যেন কিছুটা অনুকম্পাই করছে। আর, যেহেতু সে 'ওভাম ডোনেট' করছে, ফলে কিছুটা বুঝি অহমিকাও কাজ করছে তার মধ্যে।

আমি অনেক সময়ই দেখেছি, যাদের বাচ্চা হচ্ছে না, সমাজের চোখে তারা যেনো কিছুটা অনুকম্পাপ্রার্থী। এই একবিংশ শতাব্দীতেও।

এখন রোগী ও সেই আত্মীয়া দুজনেরই হরমোন চিকিৎসা চলবে। যখন সেই আত্মীয়ার ডিম্বাশয় থেকে ডিম ফুটবে তখন সেখান থেকে ডিম নিয়ে রোগীর স্বামীর স্পার্মের সাথে সংযোগ ঘটিয়ে রোগীর জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। অনেক রোগীই অন্যের কাছ থেকে ডিম নিয়ে বাচ্চা নিতে চান না। কিন্তু অনেকেই আবার মা হবার আশায় সবকিছুই মেনে নেন। পরবর্তী সময়ে রোগীকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল ও হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়- যাতে সে একটি সুস্থ বাচ্চার মা হতে পারে।

বাচ্চা আমার চাই-ই

হ্যাঁ, এ কথাটিই শুনেছিলাম মেয়েটির মুখে। মেয়েটি দৃঢ়স্বরে স্বামীকে বলছিলো, যেভাবেই হোক বাচ্চা আমার চাই-ই।

পরে অবশ্য সবই শুনলাম। স্বামীটি অক্ষম, মানে তার Semen-এ কোনো স্পার্ম নেই। শুক্র নেই। হয়ত সামান্য ভুলের কারণে অথবা ছোটবেলায় কোনো রোগের (Mumps) কারণে স্বামীর শুক্র তৈরির ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের আগে ধারণা ছিলো, মাত্র ১০% ক্ষেত্রে স্বামীদের কারণে বাচ্চা হয় না। অথচ এখন দেখা

(বাকি অংশ পরের পৃষ্ঠায়)

(২য় পৃষ্ঠার পর)

যায়, প্রায় ৪০% ক্ষেত্রে বাচ্চা না হওয়ার জন্য স্বামীরাই দায়ী। আমাদের দেশের চিত্রটা কেমন?

যখন একটি মেয়ের বাচ্চা হয় না- সবটুকু দোষ হয় মেয়েটির। তাকে মাথা নিচু করে থাকতে হয় সারাক্ষণ। স্বামী জোর গলায় বলবে, আমার কোনো দোষ নেই। অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আসতে চাইবে না। যদিও এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। আমরা দেখেছি, Azoospermica মানে কোনো স্পার্মই নেই- ডাক্তাররা বলে দিয়েছেন, আর কোনো সম্ভাবনা নেই, এমন রোগীদেরও বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ায়- যেমন PESA, TESA দ্বারা সন্তান উৎপাদন সম্ভব। ছোট্ট একটু পরীক্ষা। সিরিঞ্জ দিয়ে সরাসরি অন্ডকোষের উপরিভাগ থেকে

স্পার্ম সংগ্রহ করা হয় এবং ICSI নামের প্রক্রিয়ায় গর্ভসঞ্চার করা হয়। ডিমের মধ্যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় একটি দুটি শুক্রকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়- বিশেষ ধরনের মাইক্রোসকোপের সাহায্যে।

ওই রোগীটিরও পুরো চিকিৎসা আমরা দেখেছিলাম, তাকে PESA করা হয়েছিলো এবং কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীকে গর্ভসঞ্চার করা হয় (ART)। অবশেষে মেয়েটি গর্ভবতী হয়। কাজেই, হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

আমরা সাধারণত মনে করি, Azoospermic রোগীর আর কোনো সম্ভাবনা নেই। সেটা ঠিক নয়। নানা ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। কাজেই কোনো Azoospermic স্বামীর স্ত্রী যদি বলে, বাচ্চা আমার চাই-ই। তাহলে এখন আর সেটা কোনো অন্যায় আবদার নয়।

আজ এখানেই শেষ। আমি শুধু কয়েকটি কথা বলবো, আমার উপলব্ধি থেকে যা অনেককেই ফেরাতে পারে বিপথ থেকে:

১. এমআর বা ওয়াশ বা বাচ্চা নষ্ট করা একেবারেই উচিত নয়। দেখা যায়, বিয়ের পরপরই না জেনে মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে। তখন কাউকে না বলে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় সে এমআর করেছে। পরবর্তীকালে সে আর কোনো দিন মা হতে পারলো না। কারণ জরায়ুর দুপাশে দুটি টিউব থাকে যা খুবই স্পর্শকাতর। সামান্য ইনফেকশনেই বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র টেস্টটিউব বেবি ছাড়া তার আর কোনো পথ খোলা থাকে না। তারও সম্ভাবনা মাত্র ৩০%। আবার দেখা যায়, পরীক্ষা বা চাকরির দোহাই দিয়ে মেয়েরা এমআর করছে। তারা জানে না, তারা নিজেদের ভবিষ্যতকে কোন অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অনেক রকম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আছে যা ব্যবহার করা যায়।

(২) ছেলেরা অনেক সময় অল্প বয়সে না বুঝে অন্যায় করে ফেলে। পরবর্তীকালে সে আর কখনো বাবা হতে পারে না। অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসেও এরকম হতে পারে। কাজেই সবকিছু বুঝে-শুনে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় সুস্থ পদপেক্ষ নেয়াই হোক আমাদের আজকের দিনের প্রত্যাশা। ●

অধ্যাপক লায়লা আর্জুমান্দ বানু
গাইনি রোগ বিশেষজ্ঞ

স্বা স্থ্য খ ব র

শিশুদের নিরাবেগ করছে প্রযুক্তি!

অবসরে টেলিভিশন, কম্পিউটার, স্মার্টফোন আর ট্যাবলেটের মতো প্রযুক্তিপণ্য নিয়ে কাটালে সময়টা বেশ কেটে যায়। খেলার মাঠের অভাব, মা-বাবা হিসেবে বাচ্চাকে পর্যাপ্ত সময় দিতে না পারা, নিরাপত্তার অভাববোধ-এমন নানা কারণে মা-বাবারা শিশুদের জন্য তাই প্রযুক্তিপণ্যই বেছে নেন। কিন্তু যন্ত্র নিয়ে সময় ব্যয় করতে করতে শিশুরা ভুলে যাচ্ছে, কী করে মানুষের মুখ দেখে মনের ভাষা পড়তে হয়। গবেষণায় একেবারে হাতেনাতে এমন প্রমাণ পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলসের বিশেষজ্ঞরা।

গবেষণার অংশ হিসেবে তাঁরা স্কুলগামী ৫১ কিশোর-কিশোরীকে একটি ক্যাম্পে রাখেন। এসব শিশুদের পাঁচ দিন একসঙ্গে রাখার সময় তাদের হাতে কোনো ধরনের প্রযুক্তিপণ্য দেওয়া হয়নি। ৫৪ জনের অন্য একটি দলকে তাদের প্রযুক্তিপণ্য ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। পাঁচ দিন পর তাদেরকে হাসি, কান্না, রাগসহ নানা অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের ছবি দেখানো হয়। এসব ফটোগ্রাফ ছাড়াও দেখানো হয় বিভিন্ন ভিডিওচিত্র। এসব ছবিও ভিডিওচিত্র দেখে প্রথম দলের ৫১ কিশোর-কিশোরী বেশি ভালোভাবেই মানবিক আবেগগুলো ধরতে পেরেছে। অথচ দ্বিতীয় দলটি এ ক্ষেত্রে ততটা ভালো করতে পারেনি। এর কারণ ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রযুক্তিপণ্য নিয়ে সময় কাটানোর কারণে শিশুরা সরাসরি সামাজিক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষের মুখোমুখি না হওয়ায় তারা শিখছেই না, কী করে মানুষের অবাচনিক যোগাযোগের ভাষা পড়তে হয়। ●

স্বা স্থ্য খ ব র

শ্বাসনালীতে সংক্রমণ

অ্যাডিনয়েড এক ধরনের লসিকা কলা, যা নাকের পেছনে গলবিলের উপরিভাগে থাকে। ৩-১২ বছরের শিশুদের উর্ধ্ব শ্বাসনালি বা অ্যাডিনয়েডে সংক্রমণের কারণে হতে পারে নানা সমস্যা।

অ্যাডিনয়েডের জন্য সব সময় নাক বন্ধ থাকার কারণে কিছু সমস্যা হয়। যেমন- শিশু মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়, হাঁ করে ঘুমায়, ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে, ফলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। সর্বদা সর্দি পড়তে থাকে, সাইনোসাইটিস লেগেই থাকে। নাকি স্বরে কথা বলে।

আবার অ্যাডিনয়েডের জন্য কানের নালি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে মাঝেমধ্যে কানে ব্যাথা হয়, মধ্য কর্ণে পানি জমে বা সংক্রমণ হয়, বাচ্চা কানে কম শুনতে পারে। খেয়াল করুন স্কুলে মনোযোগ কমে যাচ্ছে কি না, শিক্ষকের কথা অনুসরণ করতে পারছে কি না বা উচ্চ শব্দে টেলিভিশন দেখে কি না। অ্যাডিনয়েডকে অবহেলা করা যাবে না। এটি দীর্ঘমেয়াদি জটিলতা ডেকে আনে। যেমন- শিশুর খেতে কষ্ট হয়, খেতে সময় লাগে বেশি। পড়ালেখায় পিছিয়ে পড়ে। শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

চিকিৎসা কী

অ্যাডিনয়েড যদি অল্প বড় হয় তাহলে ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়। বেশি বড় হয়ে গেলে ও শ্বাসনালিকে বাধাগ্রস্ত করলে অস্ত্রোপচার দরকার হবে। ●

ডা. সতীনাথ সরকার
নাক, কান ও গলা বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

আদিকাল থেকেই মানুষ অসুখে-বিসুখে প্রাকৃতিক উপাদান বিশেষভাবে ভেষজ পদার্থ ব্যবহার করে আসছে। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে এসব ভেষজ উদ্ভিদের অনেকগুলোই লোকজ বা আঞ্চলিকভাবে (folkloric reputation) স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নত বিশ্বেও ভেষজ উদ্ভিদের চিকিৎসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাই দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নীরব ঘাতক স্বভাবের যে রোগটি মানবদেহে অসংখ্য ব্যধির উৎস, সেই ডায়াবেটিসের অব্যাহত অভিযাত্রায় বিশ্ববাসী আজ শঙ্কিত। সেজন্য এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের পাশাপাশি ভেষজ চিকিৎসা ব্যবস্থা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অথবা আদৌ কোন উপকার করে কিনা তা জানা প্রয়োজন। আমরা এ সংখ্যা থেকে দু'টি করে ভেষজ উদ্ভিদের সুপ্ত গুণাবলী নিয়ে আলোকপাত করবো। আশা করা যায় এটি ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

বট

প্রচলিত নাম: বট

বৈজ্ঞানিক নাম: *Ficus benghalensis L.*

ইংরেজি নাম: Bodhi tree, poepel tree, Sacred tree

পরিবার (গোত্র): Moraceae

ব্যবহার্য অংশ: ফুল

ব্যবহার পদ্ধতি: বটের ফুল শুকিয়ে গুঁড়া করে পানিতে মিশিয়ে খালি পেটে খেতে হবে। বটের ফুলের গুঁড়া রক্তের শর্করা শোষণ বিলম্বিত করে। সেইজন্য ধরন-১ এবং ধরন-২ উভয় প্রকারের ডায়াবেটিক রোগীরা খেলে উপকৃত হতে পারেন। ●

চিরতা

প্রচলিত নাম: চিরতা

বৈজ্ঞানিক নাম: *Swertia chirata Buch-Ham. ex Wall.*

ইংরেজি নাম: Clearing nut tree, Bitter stact churette Indian, Indian Genting

পরিবার (গোত্র): Gentianaceae

ব্যবহার্য অংশ: পাতা

ব্যবহার পদ্ধতি: পাতার রস খালি পেটে খেতে হবে। পাতার রস ইনসুলিন নিঃসরণ বাড়ায়। সেজন্য ইনসুলিন অনির্ভরশীল রোগীরা খেলে উপকৃত হতে পারেন। ●

প্রথম পৃষ্ঠার পর: ডায়াবেটিস জয়ের কাহিনী

৯ বছর ধরে ইনসুলিন পাম্প ব্যবহার করে আসছিলেন তিনি। কঠোর নিয়ন্ত্রণে চলে এলো রক্তের গ্লুকোজের মান। গর্ভধারণের আগে তার রক্তে HbAIC ছিলো ৬-এর বেশি, গর্ভধারণের সময় তা নেমে এলো ৫.৫-এ। রক্তের গ্লুকোজ নিয়মিত পরীক্ষা এবং সেই সঙ্গে ইনসুলিন মাত্রা এডজাস্ট করায় এ অর্জন সম্ভব হয়েছিলো।

তবে, ব্যাপারটা সহজ ছিলো না। গর্ভবতী নারী ডায়াবেটিক রোগী হলে গর্ভধারণের সময় তাকে সার্বক্ষণিক গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে সম্পৃক্ত হওয়া কঠিন ছিলো বৈকি। তার ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং তার চিকিৎসকের সহায়তায় এটি সম্ভব হয়েছিলো।

মিস আমেরিকা সিংহভাগ কৃতিত্ব দিয়েছিলেন তার ডাক্তার লুই জোভানোভিককে। বিশ্বাস করতে পারেন, নির্ভর করতে পারেন এমন একজন ডাক্তার পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার বৈকি! গর্ভধারণের প্রস্তুতি মানে মাল্টিভিটামিন ও ফলিক এসিড ভিটামিন খাওয়া নয়।

নিকোল ও তার ডাক্তার দুজনে মিলে একে মোকাবেলা করলেন।

এদিকে তার স্বামী স্কট ছিলেন খুবই সহানুভূতিশীল ও সহমর্মী, বড় অবলম্বনও।

নিকোলের বক্তব্য ছিলো, স্বামীকে হতে হবে ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে পুরোপুরি Involved।

যেমন, তার স্বামী স্কট শিখে নিয়েছিলেন কী করে গ্লুকোমিটার দিয়ে নিকোলের রক্তের গ্লুকোজ মাপা যাবে। নৈশকালীন ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনার কিছু টিপস্‌ও তিনি জেনে নিয়েছিলেন।

গর্ভধারণের সময়, প্রতি দু' ঘন্টা পর পর নিকোল মেপে দেখতেন তার রক্তের গ্লুকোজ। রাতে দু'বার ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি চেক করতেন ইনসুলিন পাম্প, প্রয়োজনে এডজাস্টও করতেন।

নিকোল ঘুমিয়ে থাকলে তাকে না জাগিয়েই স্কট তার গ্লুকোজ চেক করতেন। নিকোল ছাড়াও তার প্রসবের পর সদ্যজাত শিশুর পরিচর্যা করেন স্বামী স্কট।

তার ডাক্তার জোভানোভিক বলেন, অবলম্বন হিসেবে প্রিয়জন থাকলে নারীর গর্ভধারণ সহজ ব্যাপার বটে। সেই সঙ্গে থাকতে হবে কৌতুকপ্রিয় মন, এটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপত্র।

মিস আমেরিকা নিকোল স্বীকার করেন, যখন প্রথম তার ডায়াবেটিস ধরা পড়ে, তখন এর প্রভাবের গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারেননি। তার বোধোদয় হয়েছিলো ১৯৮৯ সালের একটি চলচ্চিত্র 'Steel magnolias' দেখে। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন জুলিয়া রবার্টস। চলচ্চিত্রটিতে দেখানো হয় জুলিয়া রবার্টসের ডায়াবেটিস, গর্ভবতী হবার পর তার রোগ জটিল হয়ে পড়লে তিনি মারা যান। কিডনি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার কারণেই তার মৃত্যু হয়।

নিকোলের ভয় জন্মেছিলো মনে। তিনি প্রথমে গর্ভবতী হতে চাননি। যদি জটিলতা দেখা দেয়, যদি মারাত্মক হয় পরিণতি! কিন্তু একসময় সে ভয় কাটিয়ে ওঠেন তিনি। অবশ্য এরই মধ্যে তিনি একটি শিশু দত্তকও নিয়ে ফেলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ডায়াবেটিস সম্বন্ধে বেশ কিছু ধারণা লাভ করেন। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস কী করে মোকাবেলা করা যাবে, এসব কৌশলও জানলেন।

তারপর এক সময় বিয়ে করলেন, গর্ভধারণ করলেন, নিরাপদে সন্তানও জন্ম দিলেন। সফল ক্যারিয়ার, অসুখকে জয় করা, আর মিস আমেরিকা হওয়া–আর কি চাই?

একজন মহিলা ডায়াবেটিক রোগী গর্ভধারণ করলে কি কি সতর্কতা নিতে পারেন সে ব্যাপারে রয়েছে মিস আমেরিকা নিকোলের ডাক্তারের পরামর্শ:

'রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা যে নিয়ন্ত্রণে আছে তা নিশ্চিত করতে হবে। গর্ভধারণের পরিকল্পনার সময় একজন মহিলা ডায়াবেটিক রোগীর প্রথম কাজ হলো, রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে নেয়া। গর্ভধারণের সময়, বিশেষ করে, প্রথম সপ্তাহগুলোতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি থাকলে জন্মগত ত্রুটির ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।

'চোখের ডাক্তারকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে। গর্ভাবস্থায় চোখ, কিডনি ও হৃদপিণ্ড– সবই চাপগ্রস্ত হয়, তাই আগেভাগেই এসব অঙ্গ সুস্থ ও সজীব আছে কিনা চেক্ করে নেয়া ভালো।

'একজন এন্ডোক্রিনোলজিস্টের পরামর্শ নেয়া উচিত, তিনি হৃদপিণ্ড ও কিডনির ওপর গর্ভাবস্থার ঝুঁকি বুঝতে পারেন। রক্তচাপ স্বাভাবিক কিনা তাও চেক করানো উচিত। ডায়াবেটিস না থাকলেও যদি কেবল উচ্চ রক্তচাপ থাকে তার জন্যও বেশ ক্ষতি হয় গর্ভের শিশুর। আবার উচ্চ রক্তচাপের সব ধরনের ওষুধও গর্ভের সময় খাওয়া যায় না।

'একজন স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে, যার ওপর রোগী নির্ভর করতে পারেন। বিশেষভাবে, যার ডায়াবেটিস ও গর্ভাবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। ●

অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী
পরিচালক, ল্যাবরেটরি সার্ভিসেস, বারডেম জেনারেল হাসপাতাল এবং সাম্মানিক অধ্যাপক, ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ

সঁপে দিন না আপনার চোখ দুটো আমাদের হাতে

ডা. মানস কুমার গোস্বামী

ডায়াবেটিসে যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগস্ত হয়- এদের মধ্যে চোখ অন্যতম। চোখ এমনিতেই খুব সংবেদনশীল অঙ্গ, তার ওপর ডায়াবেটিস হলে তো কথাই নেই, ঘন ঘন পাওয়ার বদলে যায়, ডায়াবেটিস বাড়লে-কমলে চোখের পাওয়ারও বাড়ে-কমে– একেবারে অঙ্কের হিসাব। তবে ভয়ের কিছু নেই- এটা মামুলি ব্যাপার, আপনার ডায়াবেটিস একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখুন, চোখের পাওয়ার নিয়ে আর ঝামেলায় পড়তে হবে না। তবে, ডায়াবেটিস যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে তবেই ঝামেলা- বলা ভালো, ঝামেলার শুরু। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস নিয়ে যতোই দিন গড়াবে, আস্তে আস্তে চোখে ছানি পড়বে, তখন আপনাকে যেতে হবে বিশেষজ্ঞ চক্ষু সার্জনদের ছুরির তলায়। তার মানে, খসে যাবে অনেক টাকা। তবে এতে করে আপনি দৃষ্টিশক্তি আবার ফেরত পেতে পারেন যদি না পরবর্তী ভয়াবহ জটিলতার সৃষ্টি না হয়। আর, সেটা হলো 'রেটিনোপ্যাথি'।

শুনতে মধুর এ বস্তুটি কিন্তু নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। এতে চোখের ভেতরে রেটিনার রক্তক্ষরণ ঘটে, বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ দিনে দিনে জমাট আকার ধারণ করে, পরে রেটিনার বিভিন্ন ছোট ছোট জায়গা রক্তশূন্য হয়ে মরে যায়। পরবর্তী সময়ে গোটা রেটিনাই আক্রান্ত হয় এবং তখন অন্ধত্ব মোটামুটি নিশ্চিত।

এ অবস্থারও চিকিৎসা আছে। তবে, ফল আশাব্যাঞ্জক নয়। অনেক বড় বড় অপারেশন নামি-দামি সব যন্ত্রপাতি দিয়ে হয়, যেমন– লেজার, ভিট্রেকটমি ইত্যাদি। আবার হঠাৎ করে আপনি ট্যারাও হয়ে যেতে পারেন। চোখের এই জটিল অবস্থার চিকিৎসার তেমন ভালো ফল হয় না বলেই আমাদের চেষ্টা করা উচিত- যাতে কোনো ডায়াবেটিক রোগীই এ জটিলতার পর্যায়ে উপনীত না হন। এর জন্য আগেভাগেই সচেতন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে আপনার চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ শিরোধার্য।

ডায়াবেটিক হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা বিষয়ে কিছু টিপ্স বর্তমান বারডেম হাসপাতালের বহির্বিভাগের একটা বড় অংশ এবং অন্তর্বিভাগের (হাসপাতালের) গোটা দশতলা জুড়ে রয়েছে চক্ষু বিভাগ।

বহির্বিভাগে দূরদূরান্ত থেকে আগত রোগীদের দেখে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়। প্রয়োজনে রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া হয় এবং অপারেশন করা হয়।

কীভাবে ডাক্তার দেখাবেন

আপনি যদি একজন ডায়াবেটিক রোগী হয়ে থাকেন এবং যদি আপনার নিবন্ধনকৃত গাইড বই থেকে থাকে (তা যে কোনো ডায়াবেটিস সেন্টারের হোক না কেন) তবে অতি সহজেই এবং বিনা পয়সায় চক্ষু সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে পারবেন। আপনি সোজা চলে আসুন বারডেমের চক্ষু বিভাগের ১৮ নম্বর কাউন্টারে। এখানে আপনাকে অভ্যর্থনা জানানো হবে এবং পাঠিয়ে দেয়া হবে যে কোনো একটা রুমে যেখানে বিজ্ঞ ডাক্তারগণ বসে আছেন আপনার জন্যই। সেখানে আপনাকে দু' লাইন বাংলা বা ইংরেজি বা 'উ' পড়তে বলা হবে এবং তার মধ্য দিয়েই ডাক্তার বুঝে ফেলবেন আপনার দৃষ্টিশক্তির সমস্যা কতোটা। তারপর আপনার চোখে দেয়া হবে বিশেষ একটি ড্রপ- এর ফলে একটু জ্বালা করতে পারে, তবে ভয়ের কিছু নেই, নিমিষেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর আপনাকে প্রায়

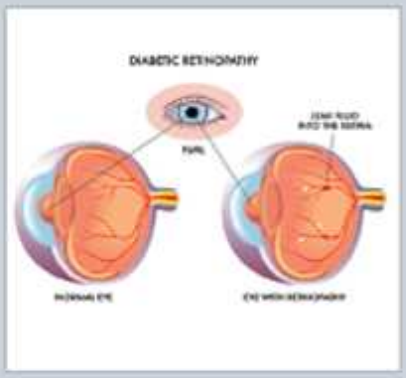

ঘন্টা আধেক অপেক্ষা করতে হবে- বাইরের করিডোরে, মাথার ওপরে ফ্যান আছে- আপনার ততোটা কষ্ট হবে না। এর মধ্যে আপনার চোখের মনি বড় হয়ে যাবে এবং আপনার আবার ডাক পড়বে। কোনো সমস্যা পেলে ডাক্তার আপনাকে আবাসিক সার্জন অথবা কনসালটেন্টদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর সে রকম কোনো সমস্যা না হলে আপনাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হবে। কোনো সমস্যা না থাকলে ডাক্তার হয়তো বলবেন, আপনার চোখ ভালো আছে, ছয় মাস বা এক বছর পরে আসুন। এভাবেই আমরা একদিন আপনার চোখের মধুমেহ সংক্রান্ত জটিলতার প্রাথমিক পর্যায়েই ধরে ফেলতে পারবো। এবং এ পর্যায়ে আপনাকে চিকিৎসা দিলে এবং সতর্ক করে দিলে আপনি যদি তা মেনে চলেন আর যাই হোক ডায়াবেটিসজনিত কারণে অন্ধ হবেন না, গ্যারান্টি।

জেনে রাখুন

বারডেমের চক্ষু বিভাগ বাংলাদেশের যে কোনো হাসপাতালের চক্ষু বিভাগ থেকে বড়; বাংলাদেশের যে কোনো চক্ষু হাসপাতালের চেয়ে সমৃদ্ধ এবং শিক্ষিত। বড়– আয়তনে, ব্যাপকতায়, আর দৈনিক রোগীর সংখ্যায়। সমৃদ্ধ– আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিতে, আর শিক্ষিত- দক্ষতায় এবং জ্ঞানে। বারডেম হাসপাতালের এ বিভাগের প্রতিটি চিকিৎসক স্নাতকোত্তর শিক্ষায় শিক্ষিত এবং দক্ষ। অবশ্যই বাংলাদেশ শুধু নয়, এই উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই। একটু বেশি বলা হলো? অবশ্যই না। (বাকি অংশ পরের পৃষ্ঠায়)

(৬ পৃষ্ঠার পর) প্রমাণ করতে একবার আমাদের এখানে এসে পরে বিদেশ ঘুরে আসুন। সে তুলনায় চিকিৎসাসেবা নামমাত্র মূল্যে, যেখানে ডাক্তারের পরামর্শ ফ্রি, আর অন্য যে কোনো অপারেশন হাতে গোনা পয়সায় করা সম্ভব।

আমরা কোনো রোগীকে না দেখে ফিরিয়ে দেই না। প্রতিটি রোগীর জন্য আমরা সাধ্যাতীত চেষ্টা করি কিছু না কিছু উপকার করে দিতে।

এতোসব সুবিধার মধ্যেও যদি কোনো রোগীকে ডায়াবেটিসজনিত জটিলতায় অন্ধত্ব বরণ করতে হয়, তবে তা হবে বিষাদসিন্ধু, হাসপাতালের চক্ষু চিকিৎসকদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এটা অনেক সময় ঘটে রোগীর অজ্ঞতা বা অলসতার কারণেও।

অতএব, যেখানে এতোজন চক্ষু চিকিৎসক এতোসব যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে আছেন আপনার চক্ষু চিকিৎসার জন্য- সেখানে আর দেরি কেন, গাফিলাতি কেন। এসেই দেখুন না, আমরা তো আছি, সুযোগ দিন না আপনাকে সেবা করার।

আর একটা কথা, আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলেও ভয় নেই, সঁপে দিন না আপনার চোখ দুটো আমাদের হাতে। আমরা কথা দিচ্ছি, আপনাকে অন্ধ হতে দেবো না। অবশ্য এর জন্য আমাদের পরামর্শ আপনাকে পালন করতে হবে অরে অরে। চোখের আলোয় দেখুন চোখের বাইরে, আর অন্তরের আলোয় ভরিয়ে দিন সবার অন্তর। ●

ডা. মানস কুমার গোস্বামী
সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষু বিভাগ, বারডেম

স্বা স্থ্য খ ব র

তিন মাসে শিশুর মস্তিষ্ক অর্ধেক

জন্মের পর মানবশিশুর মস্তিষ্ক দ্রুত বাড়ে। তিন মাস বয়সের মধ্যেই তার মস্তিষ্ক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের মস্তিষ্কের প্রায় অর্ধেক আকার পেয়ে যায়। আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মাসিক সাময়িকী জামা নিউরোলজিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উন্নতর স্ক্যানিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গবেষকরা জানান, তুলনামূলকভাবে ছেলেশিশুদের মস্তিষ্ক মেয়েশিশুদের তুলনায় দ্রুত বাড়ে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ তথ্য ব্যবহার করে অটিজমের মতো সমস্যা শনাক্ত করা সম্ভব হবে। কয়েক শতাব্দী করে শিশুদের মস্তিষ্ক মাপতে ফিতা দিয়ে মাথায় মাপ নেওয়া হতো। এই পরিমাপের একটি তালিকাও সংরক্ষণ করা হতো। বেড়ে ওঠায় স্বাভাবিকতার বাইরে কিছু হচ্ছে কি না, তা অনুধাবনের পদ্ধতিও ছিল এটি। তবে মাথায় মাপ শিশুদের ভিন্ন হয়। এ থেকে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকরা জন্মের পর থেকে তিন মাস পর্যন্ত ৮৭টি সুস্থ শিশুর মস্তিষ্কের স্ক্যান করেন। এতে দেখা যায়, জন্মের পর থেকেই মস্তিষ্কের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নবজাতকদের মস্তিষ্কের বৃদ্ধির এই হার প্রতিদিন ১ শতাংশ পর্যন্ত। ৯০দিন পার হওয়ার পর এই হার দশমিক ৪ শতাংশে গিয়ে ঠেকে। মস্তিষ্কে সবচেয়ে ধীরে বাড়ে হিপোকামপাস অংশটি। স্মৃতি তৈরির ক্ষেত্রে এ অংশটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ●

আঙুলে হঠাৎ বিপত্তি

আঙুল নড়াচড়ায় হঠাৎ বিপত্তি, বাঁকা করতে গিয়ে আটকে গেল, খুলতে বেশ সমস্যা হচ্ছে। এ সমস্যা মাঝে মাঝেমধ্যে কারও কারও হয়। চিকিৎসবিজ্ঞানে একে বলে স্টেনোসিং টেনোসাইনোভাইটিস। সাধারণভাবে ট্রিগার ফিঙ্গার।

এমন সমস্যা বয়স্ক ও নারীদের বেশি হয়, বেশি হয় আর্থ্রাইটিস ও ডায়াবেটিসের রোগীদের। আঙুলের চাপপাশের অংশে প্রদাহই এমন সমস্যার মূল কারণ। এতে সকালবেলা আঙুলগুলো জমাট বেঁধে থাকে, সহজে কোনো কাজ করার যায় না। একবার বাঁকা করলে সহজে আর সোজা করা যায় না। মাঝেমধ্যে হাতের তালুতে আঙুলের শুরুতে ব্যথা অনুভূত হয়। সাধারণত বুড়ো আঙুল বা মাঝের আঙুলটি বেশি আক্রান্ত হয়।

ট্রিগার ফিঙ্গারে আক্রান্ত হলে চিকিৎসক আপনাকে দু-একটি ব্যথানাশক ওষুধের পাশাপাশি গরম ও ঠান্ডা সেঁক নিতে পরামর্শ দেবেন। কিছুদিনের জন্য আঙুলের বেশি কাজ, যেমন কোনো যন্ত্র চালনা বা লেখালেখি বন্ধ রাখুন। অনেক সময় চিকিৎসকেরা ছয় সপ্তাহের জন্য রাতের বেলা আঙুলকে বিশেষ ব্যবস্থায় সোজা করে রাখেন। কিছু ফিজিওথেরাপি বা ব্যায়াম শিখিয়ে দেওয়া হয়। এর পরও সমস্যা থেকে গেছে সন্ধিতে স্টেরয়েড ইনজেকশন বা অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হতে পারে।

ট্রিগার ফিঙ্গার অত গুরুতর কোনো রোগ না হলেও বিরক্তিকর সমস্যা ও কাজ কর্মে বাধা সৃষ্টি করে। তাই শুরুতেই এর চিকিৎসা নেওয়া উচিত। ●

২০ সংখ্যা ▌ফেব্রুয়ারি ▌২০১৬

ডায়াবেটিস নিউজলেটার

দাম ১০ টাকা

প্রধান সম্পাদক: অধ্যাপক একে আজাদ খান, উপদেষ্টা সম্পাদক: মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন
সম্পাদক: ফরিদ কবির, নির্বাহী সম্পাদক: শহিদুল আলম, সহকারী সম্পাদক: মীর সারওয়ার আলম
বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি কর্তৃক আরডিটিসি প্রিন্টিং প্রেস জুরাইন ঢাকা থেকে প্রকাশিত।